গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ২ | সংখ্যা : ৪ | জুলাই ২০১১

জাহানারা ইমাম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে জাহানারা ইমামের নাম ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য। একাত্তরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাফী ইমাম রুমী দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েকটি সফল গেরিলা অপারেশনের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন এবং পরবর্তীতে শহীদ হন। বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা রুমীর মা জাহানারা ইমামকে সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন। রুমীর শহীদ হওয়ার সূত্রেই তিনি 'শহীদ জননী'র মর্যাদায় ভূষিত হন।

জাহানারা ইমামের জন্ম ১৯২৯ সালের ৩ মে মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর গ্রামে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের রক্ষণশীল বাঙালি মুসলমান পরিবার বলতে যা বোঝায়, সেরকম একটি পরিবারেই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর পুরো নাম জাহানারা বেগম ওরফে জুড়ু। সাত ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। পরে জুড়ু-কে জাহান নামে ডাকা হতো। বাড়িতে বাবার কাছেই তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু। শিক্ষা জীবনে তাঁর বাবা সব ধরনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণীতে উঠার পর জাহানারার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, তখন কুড়িগ্রামে মেয়েদের স্কুল ছিল না। তাই সিদ্ধান্ড় হলো ছেলেদের স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে তার নাম থাকবে। সময়মতো তিনি পরীক্ষাও দেবেন; কিন্তু ক্লাস করতে হবে না। বাড়িতে দু'জন টিচার নিয়োগ করা হলো। তারা দু'বেলা এসে জাহানারাকে পড়িয়ে যান। গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব ছিলো ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল আর ইতিহাস পড়ানোর। কিন্তু এই মাস্টারমশাই ছিলেন সাহিত্যপাগল। তাঁর কল্যাণে, ওই বয়সেই টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, ভিকটর হুগো, সেলমা লেগারলফ, শেক্সপীয়র, বার্নাড'শ, ন্যুট হামসুন-এর অনেক বইয়ের বাংলা অনুবাদ জাহানারার পড়া হয়ে গিয়েছিলো।

১৯৪১ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবার চাকুরির কারণে তাঁরা কুড়িগ্রাম থেকে লালমনিরহাটে চলে এলেন। লালমনিরহাটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সেন্টার ছিলো না। জাহানারা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন রংপুর থেকে। দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করলেন তিনি ১৯৪২ সালে। ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি হলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজে। সেখান থেকে আইএ পাস করে ১৯৪৫ সালে ভর্তি হন কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বিএ পাস করেন ১৯৪৭ সালে।

রংপুরের মুন্সিপাড়ার মোহাম্মদ আলী উকিলের কনিষ্ঠ ছেলে শরীফুল আলম ইমাম আহমদের সঙ্গে জাহানারা বেগমের বিয়ে সম্পন্ন হয় ১৯৪৮ সালের ৯ আগস্ট। শরীফ ইমাম ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

জাহানারা ইমামের কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মাধ্যমে। সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে ১৯৪৮-১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহ-এর বিদ্যাময়ী গার্লস হাই স্কুলে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫১ সালের ২৯ মার্চ জাহানারা ইমামের কোল জুড়ে আসে শাফী ইমাম রুমী। তারপর ঢাকায় এসে ১৯৫২ সালে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে সরাসরি প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে আসীন ছিলেন। জাহানারা ইমামের জীবিত একমাত্র সন্তান সাইফ ইমাম জামীর জন্ম ১৯৫৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর। জামী বর্তমানে বিদেশিনী স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

১৯৬০ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে বি.এড. ডিগ্রি অর্জন করেন। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ওই বছর এডুকেশনাল বোর্ডের প্রতিনিধি হয়ে সিলেবাস সেমিনারে যান পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ারে। এছাড়াও পাকিস্তান অলিম্পিক গেমস্-এ খেলোয়াড়দের নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন তিনি। ১৯৬২ সালে এম.এ. পার্ট ওয়ান পাশ করেন। এরপর তিনি বুলবুল একাডেমির কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীসহ আরও দু'টি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৪ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশীপ পেয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানডিয়াগো স্টেট কলেজ থেকে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলায় এমএ পাস করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জাহানারা ইমামের রাজনৈতিক জীবনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় অঞ্জলি নামের একটি মেয়ের কথা। কলেজে জাহানারা ইমামের সহপাঠী ছিলেন অঞ্জলি। এই অঞ্জলির মাধ্যমেই কমিউনিজমের পাঠ নেন জাহানারা ইমাম। অঞ্জলি তাঁকে এ সংক্রান্ত বইপত্র পড়তে দিতো। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা যথেষ্ট উদার হলেও কমিউনিস্টদের পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ভর্ৎসনা করেছিলেন। মেয়ে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুক এটা তাঁর বাবা চাননি। স্বামীও চাননি। তাই জাহানারা ইমাম রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত থাকতে পারেননি। তবে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল পরিষ্কার। যে কারণে নিজ সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন তিনি।

জাহানারা ইমামের প্রাণপ্রিয় সন্তান রুমী ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন দুঃসাহসী গেরিলার ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করে শাহাদৎ বরণ করেন তিনি। স্বাধীনতার পর শহীদ রুমী বীরবিক্রম (মরণোত্তর) উপাধিতে ভূষিত হন। মুক্তিযোদ্ধা রুমীকে ঘিরেই জাহানারা ইমাম রচনা করেন অমর গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি'। জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ ইমামকেও পাকিস্তানি হানাদাররা নির্মম নির্যাতন করে আহত অবস্থায় মুক্তি দেয়। বিজয়ের মাত্র তিনদিন আগে শরীফ ইমাম হৃদরোগে মারা যান।

পুত্র এবং স্বামী হারানোর কষ্টকে বুকে ধারণ করে বেঁচে ছিলেন তিনি। বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদে ১৯৮০-৮২ সাল পর্যন্ত সদস্য ছিলেন তিনি। ওই বছর তিনি আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য ব্যাধি ওরাল ক্যান্সারে। প্রতি বছর একবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হতো তাঁকে। এভাবেই যাচ্ছিলো তাঁর দিন। ক্যান্সার অপারেশনের আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউটে খন্ডকালীন চাকরি করেছেন।

মরণব্যাধি ক্যান্সারের সংগে লড়াই করতে করতে অন্য আরেকটি লড়াইয়ের জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন জাহানারা ইমাম। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের লোভ এবং অদূরদর্শিতার কারণে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র একাত্তরের ঘাতক দালাল রাজাকার আলবদরদের ক্রমশঃ উত্থান তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিলো। ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী- মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির এই উত্থানকে রুখে দিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন জাহানারা ইমাম। মাতৃত্ব থেকে অবলীলায় তিনি চলে এলেন নেতৃত্বে।

১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারী ১০১ সদস্যবিশিষ্ট 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠিত হয় জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী প্রতিরোধ মঞ্চ, ১৪টি ছাত্র সংগঠন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক জোট, শ্রমিক-কৃষক-নারী এবং সাংস্কৃতিক জোটসহ ৭০টি সংগঠনের সমন্বয়ে পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে-এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জাহানারা ইমাম। দেশের লাখ লাখ মানুষ শামিল হন নতুন এই প্লাটফর্মে।

এই কমিটি ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ 'গণআদালত'-এর মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠান করে। গণআদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দশটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ১২ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত গণআদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম গোলাম আযমের ১০টি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে জাহানারা ইমাম গণআদালতের রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এই গণআদালতের সদস্য ছিলেন : এডভোকেট গাজিউল হক, ডঃ আহমদ শরীফ, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, বেগম সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, শওকত ওসমান, লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুউজ্জামান প্রমুখ। সেদিন পুলিশ ও বিডিআরের কঠিন ব্যারিকেড ভেঙ্গে বিশাল জনস্রোত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢুকে পড়েছিলো। সেই বিশৃঙ্খল পরিবেশে বর্ষীয়ান কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও কথাশিল্পী শওকত ওসমানকে গণআদালত মঞ্চে (ট্রাকে) উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি বলে মাওলানা আবদুল আউয়ালকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে গণআদালত সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গণআদালত অনুষ্ঠিত হবার পর সরকার ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ জাহানারা ইমামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে অজামিনযোগ্য মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে হাইকোর্ট ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করেন। এরপর লাখো জনতার পদযাত্রার মাধ্যমে জাহানারা ইমাম ১৯৯২ সালের ১২ এপ্রিল গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবী সংবলিত স্মারকলিপি নিয়ে তৎকালীন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পেশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী ১০০ জন সাংসদ গণআদালতের রায়ের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করলে আন্দোলনে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ১৯৯২ সালের ৩০ জুন সংসদে ৪ দফা চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

১৯৯৩ সালের ২৮ মার্চ ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সমাবেশে পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জে আহত হন জাহানারা ইমাম। ক্যান্সার আক্রান্ত বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয়া জননেত্রী চিকিৎসকদের আন্তরিক সেবায় সেরে ওঠেন। এ সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি বিদেশেও গঠিত হয় এই নির্মূল কমিটি এবং শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন। পত্রপত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠলে আন্তর্জাতিক মহলেও ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেন জাহানারা ইমাম। গোলাম আযমসহ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির আন্দোলনকে সমর্থন দেয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট।

১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণআদালত বার্ষিকীতে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণতদন্ত কমিটি ঘোষিত হয় এবং আরো ৮ জন যুদ্ধাপরাধীর নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৯৪ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণআদালতের ২য় বার্ষিকীতে গণতদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান কবি বেগম সুফিয়া কামাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে রাজপথের বিশাল জনসমাবেশে জাহানারা ইমামের হাতে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট হস্তান্তর করেন। গণতদন্ত কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন: শওকত ওসমান, কে এম সোবহান, সালাহউদ্দিন ইউসুফ, অনুপম সেন, দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, খান সারওয়ার মুরশিদ, শামসুর রাহমান, শফিক আহমেদ, আবদুল খালেক এবং সদরুদ্দিন। এই সমাবেশে আরো ৮ জন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। এ সময় খুব দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে ১৯৯৪ সালের ২ এপ্রিল চিকিৎসার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ডেট্রয়েট হাসপাতালের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন জাহানারা ইমাম। ২২ এপ্রিল ওখানকার চিকিৎসকরা জানান, চিকিৎসার আওতার সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছেন তিনি। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় মিশিগানের ডেট্রয়েট নগরীর সাইনাই হাসপাতালে ৬৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক শহীদ জননী জাহানারা ইমাম।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে লেখক হিসেবে জাহানারা ইমামের আত্মপ্রকাশ। প্রথমে তাঁর পরিচয় ছিলো একজন শিশুসাহিত্যিক হিসেবে। ছোটদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বই তিনি অনুবাদ করেন। বইগুলো পাঠক সমাদৃত হয়। তবে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনা করে তিনি পৌঁছে যান পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে। এছাড়া তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছে-

'তেপান্তরের ছোট্ট শহর', 'নদীর তীরে ফুলের মেলা', 'নগরী', 'ডালাস', 'অব ব্লাড এন্ড ফায়ার', 'সাতটি তারার ঝিকিমিকি', 'গজকচ্ছপ', 'জীবন মৃত্যু', 'চিরায়ত সাহিত্য', 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি', প্রবাসের দিনলিপি', 'ক্যান্সারের সাথে বসবাস', 'অন্য জীবন', 'বুকের ভেতর আগুন', 'এ্যান ইনট্রোডাকশন টু বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ এ্যান্ড লিটারেচার', 'বীরশ্রেষ্ঠ', 'নাটকের অবসানে', 'দুই মেরু', 'নিঃসঙ্গ পাইন', 'নয় এ মধুর খেলা' ও 'মূল ধারায় চলেছি'। ■

সম্পাদকীয়

নতুন প্রজন্ম এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার, যারা কাঁধে তুলে নেবে এদেশ গঠনের গুরু দায়িত্ব। জাতি হিসেবে তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার। আর তাই 'গুণীজন' কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষুদ্র চেষ্টা আমাদের।

আমাদের দেশে অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা সারাজীবন তাঁদের সৃজনশীল চিন্ড্র, মনন ও মেধা দিয়ে শান্তি, মানবতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন ও করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের লেখনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের দেশকে সম্মৃদ্ধ করছেন। অনেকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির এইসব গুণীব্যক্তিবৃন্দকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রয়াস আমাদের এই 'গুণীজন' উদ্যোগ। 'গুণীজন' উদ্যোগটি ইন্টারনেট, বই, সিডি এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে গুণীজনদেরকে পরিচিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'গুণীজন' ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.gunijan.org.bd

গুণীজন ওয়েবসাইটে এপর্যন্ত প্রায় ২৫৪ জন গুণীজনের জীবনী প্রকাশ করা হয়েছে। কাজ চলছে আরো একহাজারেরও বেশী গুণীজনকে নিয়ে। গুণীজন কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

এসব কাজের পাশাপাশি গুণীজন কর্মসূচি নিয়মিতভাবে 'গুণীজন' নামে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করছে। সারাদেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে গুণীজনদেরকে তুলে ধরাই এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য। এ সংখ্যায় রয়েছে-জাহানারা ইমাম, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ ও রণেশ দাশগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই জীবনীগুলোর সম্পূর্ণ তথ্য গুণীজন ওয়েবসাইটে (www.gunijan.org.bd) রয়েছে।

গত ২৬ জুন ছিল জাহানারা ইমামের মৃত্যুবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট (জাতীয় শোক দিবস) বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী, ৩ নভেম্বর (জেল হত্যা দিবস) তাজউদ্দীন আহমদ ও ৪ নভেম্বর রণেশ দাশগুপ্তের জন্মশতবর্ষ। তাই পত্রিকাটির জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যায় এই ৪ জন গুণীজনকে নির্বাচন করা হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান

৭ মার্চ ১৯৭১। রেসকোর্স ময়দানে মঞ্চ প্রস্তুত। উপস্থিত সম্মিলিত দর্শক শ্রোতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁদের অবিসংবাদিত নেতার জন্য। অবশেষে তিনি এলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন জনসমুদ্রের মঞ্চে। তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর প্রতিটি শব্দ আছড়ে পড়তে লাগল, ঢেউ খেলে গেল জনসমুদ্রের মাঝে।

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ..."রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ"।

স্বাধীনতার সংগ্রাম, যার জন্য দেশের প্রতিটি জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর নির্দেশনায় দীর্ঘ নয় মাস জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা।

এই অবিসংবাদিত নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অবিভক্ত ভারতবর্ষের গোপালগঞ্জ জেলার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তিনি ১৭ মার্চ, ১৯২০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা শেখ লুত্‌ফর রহমান আর মা মোসাম্মত্ সায়েরা বেগম। পরিবারের প্রথম পুত্র। ৪ বোন ও ২ ভাইয়ের মাঝে তৃতীয় এ সন্তানকে আদর করে ডাকা হতো 'খোকা'। ছেলেটির ভালো নাম রাখা হয় 'শেখ মুজিবুর রহমান'।

বাড়িতেই তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি, পণ্ডিত সাখাওয়াত্ উল্লাহর কাছে। ৭ বছর বয়সে ১৯২৭ সালে তাঁর স্কুল শিক্ষার শুরু গমা ডাংগা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৯২৯ সালে। শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা ছিলেন মাদারীপুর দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার। ১০/১১ বছর বয়সে তিনি পুত্রকে নিজের কাছে মাদারীপুরে নিয়ে যান। সেখানকার মাদারীপুর ইসলামিয়া হাই স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় চতুর্থ শ্রেণীতে। ১৯৩৬ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

মাদারীপুর থাকার সময়েই শেখ মুজিবুর রহমানের বেরিবেরি রোগের কারণে চোখে ছানি পড়ে। শেখ লুত্‌ফর রহমান ছেলেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডা. টি আহমদের কাছে নিয়ে যান। সেখানে সফল অস্ত্রোপচারের পর তিনি সুস্থ হলেও ডাক্তারের পরামর্শে তখন থেকেই চশমা পড়তে শুরু করেন।

তিনি যখন নবম শ্রেণীতে পড়েন তখন মিশন স্কুলে ছাত্রদের একটি সভার আয়োজন করা হয়। এসডিও ১৪৪ ধারা জারি করে সেই সভা বন্ধ করে দেন। ছাত্ররা সমবেত হয়ে মসজিদে গিয়ে সভা করে। শেখ মুজিব দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা বলতেই তাঁকে গ্রেফতার করে সেকেন্ড কোর্টে হাজির করে দু'ঘন্টা আটক রাখা হয়। ছাত্রদের বিক্ষোভ ও চাপে শেষ পর্যন্ত কোর্ট থেকেই তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এটাই তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের প্রথম গ্রেফতার।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের বিয়ে হয় ফজিলাতুন্নেসা ওরফে রেনুর সাথে। তাঁদের পরিবারে ৩ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তান জন্ম নেয়।

১৯৪০ সালে, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী, শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ স্কুল পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শন কাজ শেষে বাংলোতে ফেরার পথে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের পথ আগলে দাঁড়ায়। অকপটে বলে যায়, ছাত্রাবাসের ছাদ চুইয়ে পড়া পানিতে বর্ষাকালে ছাত্রদের বিছানাপত্র নষ্ট হবার ভোগান্তির কথা। তা মেরামতের দাবি জানায় সে। প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁর স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে ১,২০০ টাকা মঞ্জুর করেন এবং ছাত্রাবাসটি মেরামত করার নির্দেশ দেন। তখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মাওলানা আজাদ কলেজ) আইএ ক্লাসে ভর্তি হন। তখন থেকেই মুসলীম লীগ রাজনীতিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন তিনি।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৬ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে অনার্সসহ ব্যাচেলার ডিগ্রি লাভ করেন। তখন থেকেই তিনি ছিলেন প্রাদেশিক বেঙ্গল মুসলিম লীগের কর্মী এবং এরপূর্বে ১৯৪৩ সাল থেকেই ছিলেন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী-হাসিম গ্রুপের সাথে তিনি ছিলেন সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ তাঁকে ফরিদপুর জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত করে।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারপরই তিনি আবার গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি লাভ করেন শেখ মুজিব।

ওই বছর ২৩ জুন, ঢাকার রোজ গার্ডেনে এক গোপন বৈঠকে "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী-মুসলীম লীগ" গঠিত হলো। শেখ মুজিব নির্বাচিত হলেন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক পদে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অক্টোবরে আর্মানীটোলা থেকে এক বিশাল ভুখা মিছিল থেকেই গ্রেফতার হলেন মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক আর শেখ মুজিব।

১৯৫২ সাল। তিনি তখনও জেলে। ভাষার জন্য আন্দোলন-সংগ্রামে দেশ তখন উত্তপ্ত। ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিনটিকে ঘোষণা করা হলো 'ভাষা দিবস' হিসেবে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন আকস্মিকভাবে ১৪৪ ধারা জারি করলে গভীর রাতে কিছু ছাত্রনেতা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিব কারাগার থেকে এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানান এবং মহিউদ্দিন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে অনশন অব্যাহত রাখেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাওলানা ভাসানী স্বীয় ক্ষমতাবলে শেখ মুজিবকে আওয়ামী মুসলীম লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৯৫২ সালে মহাচীনের রাজধানী বেইজিং নগরীতে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন শেখ মুজিব। ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে দলের সভাপতি হবার আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে ছিলেন।

২৫ জানুয়ারি, ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। সেই সভায় মওলানা তর্কবাগীশ সভাপতি এবং শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এই প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ। ওই বছর ১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এবছর প্রথম তিন মাসে শেখ মুজিব ৮ বার গ্রেফতার হন।

এ সময় রাজনৈতিক অঙ্গন অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ৬ দফা প্রকাশ হওয়ায় বাঙালিদের হৃদয়ে আশার নতুন আলো দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত এক প্রেসনোটে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১নং বিবাদী হিসেবে শেখ মুজিবকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের গেট থেকে গ্রেফতারের ঘোষণা দেয়। এর পূর্বের ২০ মাস শেখ মুজিব জেলে আটক ছিলেন। ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি সমাপ্ত হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ মামলার অন্যতম প্রধান আইনজীবী ছিলেন। একই সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব ও পালন করছিলেন।

এ সময় ছাত্র ধর্মঘট এবং বিক্ষোভে ঢাকাসহ সারা দেশ ফুঁসে ওঠে। পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস, কারফিউ, সান্ধ্য আইন, ১৪৪ ধারায় দেশ অস্থির হয়ে ওঠে। 'জয় বাংলা' স্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে রাজপথ। সরকার 'প্যারোলে' মুক্তি নিয়ে শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের কথা বললে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স বাতিল করেন। মুক্তি লাভ করেন শেখ মুজিবসহ আগরতলা মামলার অন্য আসামিরা।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সভায় ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে সভার সভাপতি তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নিরঙ্কুশ এ বিজয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মাঝে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ১৯৯টি আসন লাভ করে।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্য দুই প্রধানমন্ত্রীর যে দাবি ভুট্টো করেছিলেন বঙ্গবন্ধু তার তীব্র সমালোনা করে তা প্রত্যাখান করেন। ১৪ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও ১লা মার্চ তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা দিলে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। দেশ জুড়ে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন।

আসে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার ঢল নামে। সবাই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার অপেক্ষায়। এ সেই দিন, যেদিন তিনি প্রদান করেন এক ঐতিহাসিক ভাষণ। তাতে ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্দেশনা আর সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির কথা।

এরই মাঝে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকা আসে আলোচনার জন্য, যা ২৫ মার্চ সকাল পর্যন্ত চলে। কিন্তু আলোচনা অসমাপ্ত রেখে হঠাৎ ইয়াহিয়া গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। এদিকে ঢাকায় ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তারা নিরীহ জনগণের উপর বর্বরোচিত হামলা করে গণহত্যা চালায়। ২৫ মার্চ সকালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান ডিএফআই চিফ মারফত খবর পান ঢাকায় ক্র্যাকডাউন হতে যাচ্ছে। সাথে সাথে তিনি দলীয় হাই কমান্ডের নেতা ও অন্যান্য নেতাদের আত্মগোপনে যাবার নির্দেশ দেন। নিজে রয়ে যান ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে। ২৫ মার্চ রাতের শুরুতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এবং পরে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর হাইকমান্ড গোপনে ভারতে চলে যায়। সেখানে অন্যান্য নেতাদের সহযোগিতায় এবং ভারত সরকারের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁকেই রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদকে মন্ত্রী করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বদ্যিনাথ তলার আম্রকাননে সরকার শপথ গ্রহণ করে। প্রবাসী এ সরকার মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা এবং বহিঃর্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ও সমর্থনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রাম, ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত আর ৩০ লাখ বাঙালির রক্তে স্নাত হয়ে স্বাধীনতার সূর্য ওঠে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। যার জন্য এতদিনের অপেক্ষা, প্রতীক্ষা।

১৯৭২ সালের ১০ মার্চ তিনি পাকিস্তান থেকে লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে আসেন। এদিন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর শিরোনাম ছিল "ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে।" দৈনিক পূর্বদেশ- "ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়।" আবারও রেসকোর্স ময়দানে এসে দাঁড়ান তিনি। লাখো মানুষ আনন্দাশ্রু ভেজা চোখে তাদের জাতির জনককে বরণ করে নেয়।

এবার তিনি হাত দেন দেশ গঠনে। মন্ত্রী পরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবার সরকার গঠন করে। তিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত প্রতিকূলতা এবং বিধ্বস্ত অবস্থার মাঝে কাজ করতে হয়।

তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি অসংখ্য সমস্যা-সঙ্কুল, সাড়ে ৭ কোটি জনমানুষ অধ্যুষিত দেশের সমস্যা সমাধানের কাজ শুরু করেছিলেন শূন্য হাতে। আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, তাদের দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন, অনাহারি ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন যোগান এবং আরো নানামুখী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়, বিপুল অস্ত্র তখনও দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে রয়ে গেছে। তিনি আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশ জুড়ে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রক্ষী বাহিনী গঠন করেন। এ পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়। এরই সাথে তাঁর সরকারের মাঝে অবস্থানকারী ক্ষমতালোভী, চাটুকার, স্বার্থলোভীর নির্লজ্জ কর্মতৎপরতায়, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শেখ মুজিবের সাথে তাঁর দুঃসময়ের অনেক প্রকৃত সাথীর দুরত্ব বেড়ে যায়।

এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য শেখ মুজিব একদলীয় 'বাকশাল' গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এবং দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কিন্তু কোনো সুখকর উন্নতি আসার আগেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্বাধীনতা বিরোধীরা ও তাদের সাথে যুক্ত হয় তাবেদার এক শ্রেণীর উচ্চাভিলাসী, সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য। এ সময় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং প্রথিতযশা রাজনৈতিক নেতারা শেখ মুজিবকে সেনাবাহিনীর এক অংশের মাঝে তাঁর উপর পুঞ্জিভূত ক্ষোভের কথা তাঁকে অবগত করেন। কিন্তু তিনি বলতেন- 'এরা আমার সন্তানের মতো।' তাঁর স্বভাব-সুলভ উদারতা তাঁর বিপদ ডেকে আনে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল। রাতে সেনাবাহিনীর বিপথগামী সেনারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন ঘেরাও করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং তাঁর পুত্র, পুত্রবধু, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজনসহ ১৭ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ■

লেখক : রাজিত আলম পুলক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ঊর্মি লোহানী
শেখ রফিক

সম্পাদক
মৌরী তানিয়া

প্রকাশক
গুণীজন কর্মসূচি, ডি.নেট

মুদ্রণে
চিত্রকল্প

অলংকরণ
মোঃ শাহজাহান কাজী

যোগাযোগ
৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.gunijan.org.bd
ফোন ঃ +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০১৮১৪৬৫২৪৯৬-৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০২৮১৪২০২১

তাজউদ্দীন আহমদ

একজন কয়েদি তিনি। কারাগারের নিউ জেল বিল্ডিং ভবনে বন্দি। সেই শৃঙ্খলিত চত্বরে পচা নর্দমা ভরাট করে বানানোর ইচ্ছা ফুলের বাগান, তাই ফুল গাছ লাগানোয় ব্যস্ত। নিজ হাতে মাটি ভাগ করে, আপন তত্ত্বাবধানে রোপন করে চলেছেন শত ফুলের চারাগাছ। পরিচর্যার জন্য গোবর সার আনিয়েছেন বাড়ি থেকে। তাঁর হাতের মমতামাখা স্পর্শে চারাগুলো যেন স্নাত হয় সঞ্জীবনী ধারায়। তাঁর অনুপস্থিতিতেও বেড়ে উঠবে, বিকশিত হবে, ফুল ফুটবে সেগুলোয়। তাঁর স্পর্শধন্য চারাগুলো এ প্রতিজ্ঞাই শোনায় কানে কানে আর তা বিশ্বাস করেই যেন তন্ময় হয়ে, নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার চারাই রোপন করে চলেছেন তিনি।

রাত। এবার কারাগারের কক্ষে তিনি। বাইরে নিথর থকথকে অন্ধকার। হঠাৎ খুলে যায় কারাগারের মূল ফটক। চত্বরে প্রবেশ করে কালো পোশাকধারীর নেতৃত্বে অস্ত্রধারী ৪ জন সৈন্য।

বেজে ওঠে পাগলা ঘন্টা। বেজে ওঠে ডিআইজি প্রিজনের টেলিফোন। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে এক দাম্ভিক দানবীয় কণ্ঠস্বর। 'Let them do whatever they want.' ডিআইজির হাত ঘুরে জেলারের হাতে ধরিয়ে দেয়া তালিকা অনুযায়ী একই ঘরে সমবেত করা হয় তিন সহযাত্রীসহ তাঁকে। এবার পরিচয়ের পালা। ইনি...। থমকে যায় বক্তা। পরিচিতির প্রথম শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে গর্জে ওঠে ঘাতকের হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। ৬০ রাউন্ড গুলির পর সব কিছু স্তব্ধ। সুনশান। নীরব। মৃত্যুই শুধু যেন নীরবতাকে ধারণ করার স্পর্ধা রাখে। তিন সহযাত্রী নেতাসহ খুন হন, স্বাধীন বাংলাদেশের ধাত্রী। তাজউদ্দীন আহমদ।

শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ের, গজারি বনের ছায়া ঢাকা, গ্রাম বাংলার অন্যান্য গ্রামের মতোই, ঢাকার অদূরে কাপাসিয়ার দরদরিয়া গ্রাম। মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের মৌলবি ইয়াসিন খান আর মেহেরুন্নেসা খানম দম্পতির এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই তারিখে। পুত্রের নাম রাখা হয়, তাজউদ্দীন আহমদ।

৪ ভাই, ৬ বোনের মাঝে ৪র্থ তাজউদ্দীন আহমদের পড়াশোনা শুরু বাবার কাছে আরবি শিক্ষার মাধ্যমে, একই সময়ে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হন বাড়ির দুই কিলোমিটার দূরের ভূলেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অর্জন করেন। ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন বাড়ি থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরের কাপাসিয়া মাইনর ইংলিশ স্কুলে। এরপর বিদ্যালয় পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় পড়েছেন কালিগঞ্জ সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশন, ঢাকার মুসলিম বয়েজ হাই স্কুল ও সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলে। এসময় একজন স্কাউট হিসেবে স্কাউট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তী কর্মজীবনে যা তাঁর প্রেরণা ও কাজ করার ক্ষমতা জুগিয়েছে। এম.ই স্কলারশিপ পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে এই পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলায় দ্বাদশ স্থান লাভ করেন তিনি। এ সময়ই জড়িয়ে পড়েন মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে। হয়ে ওঠেন পার্টির সক্রিয় সদস্য। এবছর নির্বাচনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। যদিও মুসলিম লীগের গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির প্রতিবাদে, পরবর্তীতে দলের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। একই বছর কলকতায় শেখ মুজিবুর রহামনের সাথে পরিচয় হয় তাঁর। ভালো পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল উচ্চ মাধ্যমিকেও। ঢাকা বোর্ডে অর্জন করেন ৪র্থ স্থান এবং ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর বিষয় ছিল অর্থনীতি।

জড়িয়ে যান সক্রিয় রাজনীতিতে। যদিও চিন্তা ধারায় দেশ ও রাজনীতির বীজ রোপিত হয়েছিল অনেক আগেই সেই কাপাসিয়াতে। সেইসময় এই কাপাসিয়াতেই নির্বাসিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের তিন বিপ্লবী রাজেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, বিরেশ্বর বন্দ্যাপাধ্যায় ও মনীন্দ্র শ্রীমানী। তিনি তখন কাপাসিয়া মাইনর স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাজউদ্দীনের প্রখর মেধার পরিচয় পান এই বিপ্লবীরা এবং তাঁকে ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি ও মনীষীদের জীবনী সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেন তাঁরা। তাঁদের কাছ থেকে নিয়ে পড়ে ফেলেন প্রায় ৫০/৬০ খানা বই। বিপ্লবীরা তাঁর চেতনার মাঝে রোপন করে দেন শোষণ ও বঞ্চনাহীন সমাজ আর অধিকার আদায়ের রাজনীতির বীজমন্ত্র। আর তাই তো ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন তিনি।

ভাষা আন্দোলনেও তাজউদ্দীন ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। ১৯৪৮-এর ১১ এবং ১৩ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ধর্মঘট-কর্মসূচি ও বৈঠক করেন। ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতারাসহ তিনি বৈঠক করেন। সর্বাত্মকভাবে যুক্ত থাকেন ভাষা আন্দোলনে।

১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন তাজউদ্দীন আহমদ। এ বছরই তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর মাঝে সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ঢাকা উত্তর-পূর্ব আসনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হন তাজউদ্দীন। প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ নেতা ফকির আব্দুল মান্নানকে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯ বছর। ১৯৫৯ সালের ২৬ এপ্রিল সৈয়দা জোহরা খাতুন লিলিকে সহধর্মিণী করেন। বিয়ের অলংকার ছিল বেলী ফুলের মালা।

ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্দোলনে, রাজনৈতিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য তাজউদ্দীন আহমদ ক্রমে হয়ে উঠতে থাকেন ভবিষ্যতের দৃপ্ত সারথী। চলতে থাকে রাজনীতি। গ্রেফতার হন ১৯৬২ সালে। ১৯৬৪ সালে সাংগঠনিক সম্পাদক হন আওয়ামী লীগের। ১৯৬৬ সালে হন সাধারণ সম্পাদক। ৬ দফা আন্দোলনের কারণে দেশরক্ষা আইনে ১৯৬৬ সালের ৮ মে পুনরায় গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন তাজউদ্দীন। মুক্ত হন ১৯৬৯-এর ১২ ফেব্রুয়ারি। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনায় তিনি ছিলেন ফাইলপত্র নিয়ে নিয়মিত হাজির হওয়া গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী, যিনি তাঁর দাবির ব্যাপারে ছিলেন অনড়। ইয়াহিয়া তাজউদ্দীনকে ভয় করতেন। কারণ আলোচনার টেবিলে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর, কোনো ছিটেফোঁটা আবেগও তাঁর মাঝে কাজ করত না।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত। বাঙালি জাতির উপর নেমে আসে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয়, বীভৎস, খড়গ হস্ত। গ্রেফতার হন শেখ মুজিব। তাজউদ্দীন তাঁর সহযাত্রী ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মহম্মদ আলী ছদ্মনাম নিয়ে, গ্রেফতার এড়িয়ে, শত্রু সেনার চোখ এড়িয়ে তিনি অবশেষে হাজির হন ভারতীয় সীমান্তে। যথাযোগ্য মর্যাদায়, স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে প্রবেশ করে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন। ভারত সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। জরুরি হয়ে পড়ে একটি সরকার গঠন। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আর নিজে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ এপ্রিল সরকার গঠন করেন ও ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বদ্যিনাথ তলার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করেন।

শত বাধা বিপত্তির মাঝে তিনি প্রবাসী সরকার চালিয়ে যেতে থাকেন। গঠন করেন প্রশাসনিক কাঠামো, এমনকি আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা। তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, একই সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাই যুদ্ধের সাংগঠনিক পরিকল্পনাও করতে হচ্ছিল তাঁকে। ৮নং থিয়েটার রোডের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অফিস কক্ষের পেছনে লাগোয়া একটি কক্ষে রাতে থাকতেন। যুদ্ধকালীন ঘুরে বেড়িয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়। মুক্তিবাহিনীকে, সাধারণ মানুষকে সাহস জুগিয়েছেন তিনি। শেখ মুজিবের ছিল নেতৃত্বের ক্যারিশমা আর তাজউদ্দীন আহমদের ছিল সাংগঠনিক দক্ষতা। মূলত তাঁর সুনিপুণ দক্ষতার গুণেই যুদ্ধ সঠিক পথে এগোতে থাকে। ড. আনিসুজ্জামানের ভাষায়- 'মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের পশ্চাতে তাঁর কৌশলগত চিন্তা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার ভূমিকা খুব বড় ছিল।'

দূরদর্শিতা ছিল তাঁর অসামান্য। পকিস্তানিরা একটি সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী। তাদের সাথে লড়াই করার জন্য দরকার মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, গোলা-বারুদ। এসব কিছুর ব্যবস্থা করাও সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি সবকিছু মোকাবিলা করেছেন দক্ষতার সাথে। বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সমন্বয় সাধন এবং নতুন জন্ম নেয়া বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতাও চালিয়ে যান তাজউদ্দীন। এমনিভাবে যুদ্ধের সময়ে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনও শরণার্থী শিবিরে, কখনো ভারতীয় মন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করে আবার কখনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগ্রামী শিল্পীদের সাথে নিয়ে তাঁর যুদ্ধের প্রতিটি দিন কাটতে থাকে। তাঁর তৎপরতায় সঠিকভাবেই এগোতে থাকে সবকিছু। ভারত স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। দিনটি ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ডিসেম্বরের শুরুতে ভারতীয় মিত্র বাহিনী যৌথভাবে বাঙালি মুক্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশ নেয়। প্রচন্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে পাক হানাদার বাহিনী। যুদ্ধ চলাকালীন মুজিব নগর সরকারের কতিপয় ষড়যন্ত্রী নেতা পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। পাকিস্তানিদের রসদ সরবরাহে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের পক্ষে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ প্রতিহত করা ছিল দুস্কর। অবশেষে পাকিস্তানিরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের। ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি তাজউদ্দীন এক টিভি ভাষণে বলেন- '৩০ লক্ষাধিক মানুষের আত্মাহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালি রক্তিম বলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি।'

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে এলে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ হন নয়া সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী। ১৯৭৩-এ ঢাকা-২২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থাকে চাঙা করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাঙা করে তুলতে বেগ পেতে হয় তাঁকে।

এদিকে সুবিধাভোগী, দুর্নীতিপরায়ণ, চাটুকার রাজনীতি সংশ্লিষ্টদের নির্লজ্জ তৎপরতা বেড়েই চলে। শেখ মুজিবের সাথে তাজউদ্দীন আহমদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। তাঁদের মাঝে নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়। তাঁদের সুন্দর সম্পর্কে ফাটল ধরে। এক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে দেশপ্রেমিক। চাইতেন না কোনোদিনই তাঁকে জড়িয়ে এমন কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হোক যা থেকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কোনো ক্ষতি হয়। আর তাই একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতা মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নিলেন স্বাধীনতা লাভের মাত্র ২ বছর ১০ মাসের মাথায়।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের শেষে তিনি জানতে পারেন যে, সেনাবাহিনীর মাঝে একটি গ্রুপ রয়েছে যারা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। তারা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে। ঐ রাতেই শেখ মুজিবকে নিজে গিয়ে সচেতন করেন তাজউদ্দীন। তাঁর আকাংখাকে সত্য করে দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। এ ভয়াবহ রূঢ়, নৃশংস ঘটনায় সবাই স্তম্ভিত। ঘটনার বীভৎসতায় তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু জেনেও গেলেন না তাঁর শত্রু কে আর বন্ধু কে? তিনি বন্ধুকে চিনতে পারলেন না।' তাজউদ্দীন আহমদের আক্ষেপ ছিল শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে কখনও নিভৃতে জিজ্ঞাসা করেননি স্বাধীনতা যুদ্ধের ৯ মাসের কথা।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর সবাই তাজউদ্দীন আহমদকে আত্মগোপনে যাবার জন্য বলতে থাকেন। কেননা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে পরবর্তী লক্ষ্য হবেন তাঁর কাছের মানুষরা। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৫ আগস্ট প্রথম গৃহবন্দী ও পরে ২২ আগস্ট গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি শুধু বলে গেলেন- 'ধরে নাও আজীবনের জন্য যাচ্ছি।' দৃঢ়তার প্রতীক তিনি। ৩ কন্যা, ১ পুত্রসহ স্ত্রীকে ছেড়ে যাবার সময় একটুও বিচলিত ছিলেন না তিনি। কারা অন্তরীণ তিনিসহ আরও ৩ জাতীয় নেতা। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম. মনসুর আলী, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান। জেলে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন পরবর্তী দৃশ্য কল্পের। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর অস্ত্রের দমকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় ৪ নেতার জীবন ও শরীর। সে আর এক লজ্জাজনক, বেদনা-বিধুর ঘটনা। নিহত হন বাঙালি জাতির স্বাধীনতার কান্ডারীর। ■

লেখক : রাজিত আলম পুলক

রণেশ দাশগুপ্ত

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ততদিনে রণেশ দাশগুপ্ত বাংলাদেশের অসাধারণ এক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন, যেন তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজে ঘুরে বেরিয়েছেন সারাদেশ। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের সময় সংবাদ বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সাংবাদিক জীবনে ছেদ পরে।

১৯৭৫ সালেই ঘটে রক্তাক্ত পনের আগষ্ট। তিনি তখন খেলাঘরের একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকার বাইরে ছিলেন। বিপদ বুঝে আমন্ত্রণকারীরা তাঁকে তখন আর ঢাকায় আসতে দিলেন না। কয়েকদিন পর ঢাকায় ফিরে অক্টোবরে ভাই-বোনদের দেখার জন্য' কলকাতায় চলে যান। এর পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঘটতে থাকে নাটকীয় রাজনৈতিক পরিবর্তন। আর কোনোদিন তাঁর বাংলাদেশে আসা হয়ে ওঠেনি। যখন তিনি কলকাতায় যান তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। বেঁচে ছিলেন ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত। সেখানে প্রথম আট বছর কাটান ৪/৩-এ ওরিয়েন্ট রোডে অবস্থিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কমিউনে। পরে '৮৩ সালে চলে যান বি-৪৩ সুন্দরীমোহন এভিনিউতে। এটি একসময় কালান্তর পত্রিকার অফিস ছিল। পরে সরকার এটিকে 'বিপদজনক' বলে চিহ্নিত করে। রণেশ দাশগুপ্ত 'বিপদজনক' ঘরেই বসবাস করতেন। তাঁকে দেখাশোনা করতেন পার্টিরই এক তরুণ কমরেডের পরিবার। ধীরে ধীরে তাঁর শরীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ১ অক্টোবর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে নিয়ে আসা হয় কলকাতার এক বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীর বাসায়। সেখানে কিছুটা সুস্থ হলে ৩১ অক্টোবর তাঁকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তাঁর পেসমেকার স্থাপন করা হয়। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ৪ নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রণেশ দাশগুপ্ত অনেক গ্রন্থের প্রবক্তা। গ্রন্থগুলো হল- ১৯৪২-৪৩ সালে কিশোর উপযোগী নাটক 'জানালা'; ১৯৫৬ সালে কার্ল মার্কসের জীবনী; ১৯৬৫ সালে মাও সে তুং-এর গ্রন্থের অনুবাদ 'শতফুল ফুটতে দাও'; ১৯৫৯ সালে উপন্যাসের শিল্পরূপ; ১৯৬১ সালে জিজ্ঞাসা; ১৯৬২ সালে আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রাম; ১৯৬৬ সালে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে; ১৯৬৯ সালে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কবিতার অনুবাদ; ১৯৬৯ সালে জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার সম্পাদনা; ১৯৭০ সালে 'ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম ও আলো দিয়ে আলো জ্বালা'; ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতা সাম্য বিপ্লবের কবিতা; ১৯৮৪ সালে রহমানের মা ও অন্যান্য গল্প; ১৯৮৬ সালে আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ; ১৯৮৭ সালে 'কলাম-সংকলন মনে মনে প্রকাশ; ১৯৮৮ সালে সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ' ও ১৯৯৪ সালে সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা। ■

লেখক: চন্দন সাহা রায়

গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ২ | সংখ্যা : ৪ | জুলাই ২০১১

রণেশ দাশগুপ্ত

রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১২ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতের ডিব্রুগড়ের সোনারং গ্রামে, মামার বাড়িতে। তাঁর বাবার নাম অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত। মা ইন্দুপ্রভা দাশগুপ্ত। অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত ছিলেন চাকুরিজীবি। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের গাউপাড়া গ্রামে। রণেশ দাশগুপ্তের জ্যাঠামশাই নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন পাক্কা স্বদেশী। তিনি বেশ কয়েক বছর ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী ছিলেন। নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত 'মানভূমের গান্ধী' নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

রণেশ দাশগুপ্তের পড়াশোনার শুরু পুরুলিয়ার রামপদ পল্লিতের পাঠশালায়। এখানে তিনি তিন বছর পড়াশোনা করেন। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তাঁকে ফিরে আসতে হয় রাঁচিতে। রাঁচি ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি। সেখানকার নদীর উৎস সন্ধানই তাঁর নিয়মিত পাঠক্রম হয়ে দাঁড়ায়। বাবা অপূর্বরত্ন ছিলেন স্থানীয় ফুটবল কমিটির সম্পাদক। রণেশ দাশগুপ্ত তখন বাবার 'খাস পিয়ন'। এসময় প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় এক ধরনের ছেদ পরে। বয়স দশ হতে চলেছে কিন্তু আর কোনো স্কুলে নাম লেখাননি তিনি। তিন বছর যে পাঠশালায় পড়েছিলেন সেই বিদ্যা নিয়েই শুরু করেন উপন্যাস পড়া।

এরপর তিনি রাঁচি জেলা স্কুলে ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণীতে, ইংরেজি মাধ্যমে। স্কুলের পড়াশুনার পাশাপাশি সাহিত্য পড়া অব্যাহত রাখলেন। এসময় বাড়িতে নিয়মিত আসত প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতি, বিচিত্রা, কল্লোল প্রভৃতি কাগজ। সেগুলো তিনি খুব আগ্রহের সাথে পড়তেন। তবে বাবার তরফ থেকে খেলার যে নেশাটা পেয়েছিলেন সেটাও চালিয়ে যান।

স্কুল জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বদেশী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন রণেশ দাশগুপ্ত। রাঁচির হিনু পাড়ায় ছিল জিমনাসিয়াম ও থিয়েটার। সেখানে নিয়মিত যেতেন রণেশ দাশগুপ্ত। সেখানেই বিপ্লবীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই কাজে তাঁকে প্রভাবিত করেন তাঁরই জেঠতুতো ভাই বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। আর সেই সময় 'রাজনৈতিক গুরু' হিসেবে আবির্ভূত হন জিমনাসিয়ামের শিক্ষক হরিপদ দে। সবার উদ্যোগে তৈরি করা হয় 'তরুণ সংঘ'। রণেশ দাশগুপ্ত তখন সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৯ সালেই রাঁচি জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে ভর্তি হন বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে, বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে।

রণেশ দাশগুপ্ত থাকতেন কলেজ হোস্টেলে। সেখানে ছিল অনুশীলন সমিতির শাখা। সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন অনুশীলন সমিতির সাথে। অনুশীলন সমিতির সদস্যরা তখন কংগ্রেসে কাজ করতেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় রণেশ দাশগুপ্তের উপর দায়িত্ব পরে কলেজ হোস্টেলের শাখার কাজ পরিচালনা করার। সেখানে তাঁর নেতৃত্বে কলেজে দীর্ঘদিন ধর্মঘট সংঘটিত হয়। পরিণতিতে কলেজ থেকে রণেশ দাশগুপ্তসহ ১৬ জনকে বহিস্কার করা হয়।

এরপর রণেশ দাশগুপ্ত ফিরে এলেন কলকাতায়। কোনোমতে সিটি কলেজে ভর্তি হন। থাকতেন কলেজের রামমোহন রায় হোস্টেলে। স্থান পরিবর্তন হলেও আগের পরিচিত বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে। ১৯৩১ সালে মাত্র ছয় মাস পড়াশোনা করে সিটি কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন।

রাজনীতির প্রতি ছেলের আগ্রহ পিতা অপূর্বরত্নকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি রণেশ দাশগুপ্তকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য বরিশালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে আশ্রয় মিলে কবি জীবনানন্দ দাশের পরিবারে- 'সর্বানন্দ ভবনে'। এই বাড়িতেও ছিল লেখাপড়ার অপূর্ব পরিবেশ। পরিবারের অনেকেই কবিতা লেখেন। রণেশ দাশগুপ্ত নিজেও কবিতা লেখেন। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তা ছাপাও হয়। তিনি ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ-তে ভর্তি হন। কিছুদিনের মধ্যেই রণেশ দাশগুপ্তের ঘরটি বিপ্লবীদের যোগাযোগ কেন্দ্রে পরিণত হয়। 'সর্বানন্দ ভবনের' কয়েকজন ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদে চাকরি করতেন। তাঁদের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট গেল। ফলে সেই বাড়ি ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হল বিএম কলেজের হোস্টেলে। নিয়মিত যাতায়াত করতেন রামকৃষ্ণ মিশন ও শঙ্কর মঠে। কলেজে অন্য অনেক বিপ্লবী বন্ধুদের সহায়তায় একটি মার্ক্সসীয় গ্রুপ তৈরি করেন। এই গ্রুপের পত্রিকার নাম ছিল জাগরণী। এই জাগরণী গোষ্ঠীই পরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বরিশাল জেলা কমিটির শাখায় পরিণত হয়।

রণেশ দাশগুপ্ত বরিশালে তিন বছর কাটিয়ে ফিরে আসেন ঢাকায়। তখন তাঁর পরিবারও ঢাকায় চলে এসেছে। সাত বোনের মধ্যে বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায় এবং দুই বোন মারা যায়। বাকি চার বোন, চার ভাই ও বাবা-মাকে নিয়ে গড়ে উঠলো তাঁদের নতুন সংসার। বাবার পেনশনের টাকায় সংসার মোটামুটি চলছিল। তাই পরিবারকে সাহায্য করতে ১৯৩৮ সালে সোনার বাংলা সাপ্তাহিকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত হন। রণেশ দাশগুপ্তের বেতন ছিল ২৫/৩০ টাকা। পত্রিকার সম্পাদক নলিনীকিশোর গুহ ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। তিনি তখনো 'সশস্ত্র বিপ্লববাদী' পথেই রয়ে গেছেন। আর রণেশ দাশগুপ্ত তখন পাক্কা কমিউনিস্ট। ফলে আদর্শের দ্বন্দ্ব ধরেই সেই পত্রিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। পরে সাংসারিক প্রয়োজনেই চাকুরি নেন একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে। সেই চাকুরিতে যুক্ত ছিলেন ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত।

ত্রিশের দশকের শেষ দিকে ঢাকা শহরে গোপন কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠতে থাকে। নেতারা মূলত কাজ করতেন শ্রমিকদের সাথে। ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শ্রমিকদের মধ্যে লিফলেট বিতরণের মধ্যে দিয়ে রণেশ দাশগুপ্ত শ্রমিক আন্দোলনে প্রবেশ করেন। পরে তিনি দায়িত্ব পান ঢাকার দিনমজুরদের সংগঠন গড়ে তোলার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে আবার কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পায়। তখন রণেশ দাশগুপ্ত ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে গড়ে তোলেন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন। তিনি সেই ইউনিয়নে বেশ কয়েক বছর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

চল্লিশের দশকে রণেশ দাশগুপ্তের অনন্য কীর্তি ছিল ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্পর্কে খোকা রায় লিখেছেন, "পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও গণনাট্য সংঘ ও প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংস্থার শাখা গড়ে উঠেছিল। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংস্থা বিশেষ জোরদার ছিল ঢাকাতে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন ও তরুণ কবি-সাহিত্যিক সোমেন চন্দ ছিলেন ঢাকার ঐ সাংস্কৃতিক সংস্থার নেতৃস্থানীয়।" রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন এই সংস্থার ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। এসময় তিনি নবাগত লেখকদের জন্য 'প্রগতি সাহিত্যের মর্মকথা' নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। ১৯৪২ সালে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সোমেন চন্দকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একই সময়ে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র-কমরেড প্রদ্যুৎ সরকার ও ১৯৪৪ সালে কচি নাগ নামে আরো দু'জনকে হত্যা করা হয়। ফলে ঢাকায় ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার পর প্রগতি লেখক সংঘের কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। তবে নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও এই সংঘের কার্যক্রম ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ সম্পন্ন হয়। রণেশ দাশগুপ্তের নিকটজনেরা পরিবারিক ও রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি সপরিবারে থেকে যান ঢাকাতেই। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার কিছুদিন পর পাক-শাসকগোষ্ঠী বাঙালির উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়। তখন সারা বাংলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ। ঢাকায় কমিউনিস্টরা তখন আত্মগোপনে কাজ করত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র-কমরেডরাও ছিলেন। রণেশ দাশগুপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে একটি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ গ্রেফতার হন। ছাড়া পান কয়েকদিনের মধ্যেই। কিন্তু পরে একই বছরের ৭ জুলাই আবার তাঁকে আটক করা হয়। এবং বিনা বিচারে ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ড় কারান্তরালে কাটান। দীর্ঘ ৭ বছর ৮ মাসের কারাবাসে রণেশ দাশগুপ্ত চারটি অনশনে অংশ নেন। প্রথম অনশন ১৯৪৮ সালে ঢাকা জেলে ১১-১৫ মার্চ, দ্বিতীয় অনশন মে-জুন মাসে ৪০ দিন এবং তৃতীয় অনশন হয় সরকারের 'আশ্বাস না রাখার' কারণে। চতুর্থবার অনশন করেন রাজশাহী কারাগারে। এরপর তাঁকে যশোর জেলে বদলি করা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর পরিবারও ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে একেবারে একা হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের কেউ নেই, নেই রাজনৈতিক সহকর্মীরা। এই অবস্থায় চাকুরি নেন 'ইত্তেফাকে'। দুই বছর সেখানে ফ্রি-ল্যান্স হিসেবে কাজ করেন।

১৯৫৭ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে গোপন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন রণেশ দাশগুপ্ত। তিনি শাঁখারিবাজার, তাঁতীবাজার, ইসলামপুর এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। এসময় ঢাকার ৩৫টি আসনের ৩৪টিতেই জয়লাভ করেছিল মুসলিম লীগের প্রার্থীরা। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি আবার গ্রেফতার হন। অন্য কয়েকজন বামপন্থী কর্মীর সাথে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। জেল থেকে বেরিয়েই যোগ দেন দৈনিক সংবাদ অফিসে। তিনি তখন রবিবাসরীয় পাতার দায়িত্বে ছিলেন। মূলত এখান থেকেই নিজেকে মেলে ধরতে থাকেন সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক সংগঠকের ভূমিকায়। সংবাদে তখন কাজ করতেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শহীদুল্লাহ কায়সার। গোপন কমিউনিস্ট পার্টির আরো অনেকে মিলে তখন 'সংবাদ-কমিউন' গঠন করেন। এখান থেকেই রণেশ দাশগুপ্ত চালিয়ে যান পার্টির কাজ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, আর লেখালেখি তো আছেই।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ আবার ভয়াবহ হতে থাকে। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে রণেশ দাশগুপ্ত গ্রেফতার হন। জেলের বাইরে রাজপথে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন অভূতপূর্ব জাগরণ তৈরি করে। এবার জেল থেকে ছাড়া পান ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে। আবার সংবাদে কলাম লেখক হিসেবে যোগ দেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে পাকিস্তানি হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ ঘুমন্ত বাঙালির উপর। রণেশ দাশগুপ্ত তখন পুরান ঢাকার বাসিন্দা। প্রথম কিছুদিন তিনি ঢাকাতেই আত্মগোপন করে থাকেন। পরে চলে যান নরসিংদীর রায়পুরায়। সেখান থেকে পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে ভারতের আগরতলাতে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে চলে যান কলকাতায়। রণেশ দাশগুপ্ত কলকাতায় সভা-সমিতিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বক্তৃতা করেন। মাঝে মাঝে অংশ নিতেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালাতেও।

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)